



ইতিহাসের পাতা থেকে

প্রকৃত স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিকা

গোলাম আহমদ মোর্তজা

=====

=

দিল্লীর হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রঃ) ছিলেন সে যুগের ভারতের শ্রেষ্ঠতম আলেম। ১৭০৩ খৃস্টাব্দে তাঁর জন্ম। তিনিই প্রথম চিন্তানায়ক, যিনি ইংরেজকে ভারত থেকে তাড়িয়ে দেওয়া জরুরী মনে করে সংগঠনের বীজ ফেলে গেছেন। তার পুত্র, ছাত্র ও শিষ্যগণ তার এই সুপরিকল্পিত সংগঠনের সভ্য ছিলেন। সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভী ১৭৮৬ খৃস্টাব্দে ২৯শে নভেম্বর জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি উপরোক্ত এই সংগঠনেরই সভ্য ছিলেন। ইংরেজ বিতাড়ন পরিকল্পনা তাঁর মাথায় এমন গাঢ় হয়ে বসে গেল যে, তিনি বিখ্যাত আলেম হওয়ার সময় আর পেলেন না। তবে চরিত্র মাধুর্য ও আধ্যাত্মিকতার উন্নতির চরম সীমায় পৌঁছেছিলেন। দৈহিক ক্ষমতাও তার সাধারণ মানুষের থেকে বেশী ছিল। তিনি বাচ্চাবেলা থেকেই যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা করতেন। যুবক হবার পরেও মনের অক্ষুরিত ইচ্ছা যেন ফুলে ফুলে বড় হয়ে উঠলো। তাই তিনি যোগ দিলেন এক ক্ষুদ্র সামন্ত প্রভুর সেনাবাহিনীতে; শিখলেন সামরিক কলাকৌশল। এর সঙ্গে অন্যদের সাহায্য করার বিনিময়ে শিখলেন প্রশাসনিক কাজকর্ম। কিন্তু, এই মুসলমান সামন্ত প্রভু ইংরেজদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করলো। সঙ্গে সঙ্গে ঘৃণাভরে চাকুরী খতম করে অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরলেন বাড়ীতে। তারপর শিষ্য সংখ্যা বাড়াতে লাগলেন ও সারা ভারত ঘুরে ফিরলেন।

পরে তিনি হজ্জ যাত্রা করলেন। ইংরেজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের সঙ্গে মুসলমানদের সঙ্গে সশস্ত্র সংগ্রামও করতে চাইলেন। তাই সর্বভারতীয় প্রচারে জানিয়ে দিলেন যে, কুরআন হাদীসের বিরোধী কাজ মুসলমানদের করা চলবে না। অবশ্য অনেকাংশে সফল হয়েছিলেন। পরে বিরাট একটি দল নিয়ে যখন ভারত পরিক্রমাসহ মক্কা থেকে হজ্জ করে ফিরলেন, তখন দেখা গেল, এই ভ্রমণে তাঁর দু'বছর দশ মাস পার হয়ে গেছে। সেই বিপুল সংখ্যক লোকের খাওয়া দাওয়া ও খরচার সব অর্থটুকুই তাঁর ভক্তদের কাছ থেকে উপহার হিসেবেই পেয়েছিলেন। জানা যায়, শুধু হজ্জ যাত্রীদের টিকিট কিনতেই লেগেছিল তখনকার ১৩৮৬ টাকা, আর হজ্জ যাত্রার প্রাক্কালে রেশনের মাল কিনেছিলেন ৩৩৯১ টাকার। আলিগড়ের সৈয়দ আহমাদ ও বেরেলীর সৈয়দ আহমাদ দু'জনেই ইতিহাস প্রসিদ্ধ মানুষ। তবে আলিগড়ী আহমাদ সাহেব পেয়েছেন ইংরেজের পক্ষ থেকে 'সয়ার' উপাধি, প্রচুর সম্মান, চাকুরীর পদোন্নতি প্রভৃতি। আর বেরেলীর আহমাদ সাহেব ইংরেজের পক্ষ থেকে পেয়েছেন অত্যাচার ও আহত হওয়ার উপহার আর সব শেষে শত্রুদের চরম আঘাতে তাকে শহীদ হতে হয়েছে। ভারতবাসীকে শেষ উপহার হিসাবে দিয়ে গেছেন তিনি তার রক্তমাখা কাঁচা কাটা মাথা! এই বিরাট ঋণি বিপ্লবী শহীদ বীরকে মিঃ উইলিয়াম হান্টার **The Indian Musalmans** পুস্তকে ডাকাত, ভণ্ড ও লুণ্ঠনকারী বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। তার চাপা পড়া ইতিহাসকে আজ কিন্তু কিছু বাস্তববাদী ঐতিহাসিক প্রকাশ করার জন্য নতুন সাধনায় নিয়োজিত হয়েছেন। ঐতিহাসিক রতন লাহিড়ী তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর লেখা অন্তত এটা

প্রমাণ করে যে, সত্য তথ্য প্রকাশে তিনি স্পষ্টবাদী। তাই তাঁর লেখা, 'ভারত পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সত্যিকারের ইতিহাস' থেকে সৈয়দ আহমদ বেরেলী সম্বন্ধে কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

“যার জীবনস্মৃতি প্রেরণা জুগিয়েছিলো যুগে যুগে এই দেশের মহাবিপ্লবীদের। যার জীবনাদর্শ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের আওতার বাইরে থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে আক্রমণ করা, স্বাধীন সরকার গঠন করা, আবার সেই সঙ্গে দেশের মধ্যে থেকেও সাম্রাজ্যবাদকে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করার-পথ দেখিয়ে ছিল পরবর্তীকালের মহেন্দ্রপ্রতাপ, বরকতুল্লা, এম এন রায়, রাসবিহারী এমনকি নেতাজীকেও। কে এই মহা বিপ্লবী যার আদর্শে অনুপ্রানিত হয়ে হাজার হাজার মানুষ প্রাণ দিয়েছিল ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহে-শত সহস্র মানুষ বরণ করেছিল দ্বীপান্তর, সশ্রম কারাদণ্ড, কঠোর যন্ত্রণাময় মৃত্যু। কে ইনি? ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ আর তার দালালদের লেখা ইতিহাসে এঁর নামোল্লেখ থাকলেও এর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু লেখা থাকা স্বাভাবিক নয়। আর আজও স্কুল কলেজে যে ইতিহাস পড়ানো হয় সে সব ঐ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রাচীন গলিত বিকৃত ইতিহাসের আধুনিক সংস্করণ মাত্র। তাই কি করে জানবে এই মহাপুরুষের নাম? এই মহান মহাবিপ্লবী মহাবিদ্রোহীর নাম হযরত মাওলানা সৈয়দ আহমদ বেরেলী।” (পৃষ্ঠা ৭-৯)

রতন লাহিড়ী আরও বলেন, “বিপ্লবীরা না পিছিয়ে মরণপণ সংগ্রাম করতে লাগলো। তারপর যুদ্ধ হোল শেষ। বিপ্লবী বাহিনীর হোল ধ্বংস। তাকে সকলে দেখেছিলো বীরের মত লড়াই করতে, একটার পর একটা শত্রু সৈন্য কচুকাটা করতে। যদিও নিজেরা একে মৃত বলে কবর দেয়ার ব্যবস্থা করল কিন্তু কেউ এঁর শেষ পরিণতি দেখে নি।” (শ্রী লাহিড়ীর ঐ পুস্তক, পৃষ্ঠা ৭-৮)।

এবার উইলিয়াম হান্টারের লেখা ‘দি ইণ্ডিয়ান মুসলমানস’ গ্রন্থের, বিচারপতি আবদুল মওদুদের বঙ্গানুবাদ থেকে বেশ কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি। তার পূর্বে বলে রাখি, মিঃ হান্টার হচ্ছেন মিঃ হডসনের অন্তরঙ্গ বন্ধু। যেহেতু তিনি পুস্তকের উৎসর্গ-পৃষ্ঠায় ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৩শে জুন তারিখ দিয়ে পুস্তকটি বন্ধু মিঃ হডসনের নামেই উৎসর্গ করেছেন; যে হডসন দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের দু’জন পুত্রসহ রাজবাড়ীর কচিকাচা ২৯ জনকে গুলি করে হত্যা করেছিলো। সে যাই হোক, লেখক যে একজন বিখ্যাত তথ্য সংগ্রহকারী, তাতে সন্দেহ নেই। যদিও তার লেখায় কুরআন হাদীসের বিরুদ্ধে, মাওলানাদের বিরুদ্ধে, বিপ্লবী মহামনীষীদের বিরুদ্ধে অনেক অশ্লীল কথা লেখা আছে। এই বইটি লিখতে সরকারী তথ্যসমূহ সংগ্রহ করা তার পক্ষে সহজ ছিল, যেহেতু তিনি ছিলেন সরকারি সিভিলিয়ান। তবে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত **Calcutta Review** এর C.C.I ও C.II সংখ্যায় **Wahabis i India** শিরোনামে যে তিনটি বিরাট বিরাট প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল, যার লেখকের বিচিত্র ছদ্মনাম ছিল “Anonymous”-সেই তিনটি প্রবন্ধই মিঃ হান্টারের পুস্তকের রক্ত মাংস ও অস্থি বলা যায়।

হান্টার লেখেন, “অপেক্ষাকৃত গোড়া মুসলমানেরা যখন এভাবে প্রকাশ্যে রাজদ্রোহে জড়িয়ে পড়েছে তখন সমস্ত মুসলমান। সম্প্রদায়ই প্রকাশ্যে আলোচনা করছে, জিহাদে যোগ দেয়া তাদের পক্ষে ফরজ কিনা।” “পাঞ্জাব সীমান্তে বিদ্রোহী বসতি স্থাপন করেন সৈয়দ আহমদ।” (পৃষ্ঠা ৩)

হান্টার সৈয়দ আহমদ সম্পর্কে আরও বলেন, “একজন মশহুর দস্যু সর্দারের অধীনে অশ্বারোহী সিপাহী হিসেবে তাঁর জীবন আরম্ভ। বহু বৎসর তিনি মালব প্রদেশের আফিম উৎপাদনকারী গ্রামগুলির উপর লুটতরাজ করেন। উদীয়মান শিখ শক্তির নায়ক রণজিৎ সিংহ পার্শ্ববর্তী মুসলমান অঞ্চল সমূহে যে কঠোর নীতি অবলম্বন করেন, তার ফলে কোন মুসলমান দস্যুর পক্ষে পেশা চালিয়ে যাওয়া বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর হয়ে ওঠে। সৈয়দ আহমদ বুদ্ধিমানের মত নিজেকে সময়ের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিলেন। তিনি দস্যুবৃত্তি ছেড়ে দিয়ে ১৮১৬

খৃস্টাব্দে দিল্লীর একজন মশহুর আলেম [শাহ আবদুল আযিয়া]-এর নিকট শরিয়তী শিক্ষা গ্রহণ করতে উপস্থিত হলেন। তিন বৎসর সেখানে সাগরেদী করার পর সৈয়দ আহমদ ইসলাম প্রচার করতে শুরু করেন এবং ভারতীয় ইসলামে যে সব অনাচার বা বেদাত ঢুকে পড়েছে, সেগুলির প্রতি কঠোর আক্রমণ পরিচালনা করে, একজন গোড়া ও হাজ্জাবাজ অনুচর সংগ্রহ করলেন। ... ১৮২০ খৃস্টাব্দে সৈয়দ আহমাদ ধীরে ধীরে দক্ষিণ অঞ্চলে সফর করে ফিরলেন। তখন তাঁর মুরীদান তাঁর ধর্মীয় মাহাত্ম্য স্মরণ করে সাধারণ নফরের মত তার খিদমত করতো এবং দেশমান্য আলেম খিদমতগারের মতো খালি পায়ে তার পাক্কির দু'ধারে দৌড়ে দৌড়ে যেতেন। ... ১৮২২ সালে তিনি মক্কায় হজ্জ করতে যান এবং এভাবে তাঁর পূর্বতন দস্যুবৃত্তিকে হাজীর পবিত্র আলখেল্লায় বেমালুমভাবে ঢাকা দিয়ে তিনি পরবর্তী অক্টোবর মাসে বোম্বাই শহরে উপস্থিত হন।... (শিখরা লাহোরে ও অন্যান্যস্থানে বহুদিন ধরে হুকুমাত চালাচ্ছে। তারা মসজিদে আজান দিতে দেয় না এবং গো-জবেহ বন্ধ করে দিয়েছে। যখন তাদের অপমান-অত্যাচার সহ্যের সীমা অতিক্রম করলো, তখন হযরত সৈয়দ আহমদ [তার সৌভাগ্য ও প্রশংসা অক্ষয় হোক] একমাত্র দ্বীনের হিফাজত করতে উদ্বুদ্ধ হয়ে একজন মাত্র খাদিম সঙ্গে নিয়ে কাবুল ও পেশোয়ারের দিকে রওয়ানা হলেন। ... কয়েক হাজার ঈমানদার মুসলমান তার আহ্বানে আল্লাহর রাহে চলতে তৈরী হয়েছে এবং ১৮২৬ সালের ২১শে ডিসেম্বর তারিখে বিধর্মী শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদ আরম্ভ করা হয়েছে।)

[বন্ধনী বেষ্টিত বাক্যগুলো লেখক বা অনুবাদকের নয়, জিহাদে আহ্বান সূচক এক প্রচার পুস্তিকার।] ... ১৮৩০ সালের জুন মাসে একবার পরাজিত হয়েও মুজাহিদ সৈন্যরা অকুতোভয়ে সমতলভূমি দখল করে ফেলে আর সেই বৎসর শেষ হওয়ার পূর্বেই পাঞ্চাবের রাজধানী পেশোয়ার তাদের হস্তগত হয়। তার প্রকৃত মুজাহিদ বাহিনী ছিল হিন্দুস্তানী ধর্মাবলম্বীদের নিয়ে গঠিত। ইমাম [আহমদ] সাহেবের প্রধান খলিফাদের মধ্যে দু'ভাই ছিলেন। তারা হচ্ছেন জনৈক নামজাদা নরঘাতকের দুই পৌত্র। ... তাদের হামলার হাত শিখ গ্রামগুলির ওপর পড়তে লাগলো বটে, কিন্তু বিধর্মী ইংরেজদের উপর আঘাত হানতে পারলে তারা উল্লাস উপভোগ করতো। যতোদিন আমরা জিহাদীদের দিকে নজর দিইনি, ততদিন তারা দলে দলে হামলা করে আমাদের প্রজা ও মিত্রদের ধরে নিয়ে গেছে কিংবা খুন করে ফেলেছে; আর যখন শক্তি প্রয়োগে তাদের নির্মূল করতে আমাদের সৈন্যদেরকে মারাত্মকভাবে পরাজিত করেছে এবং অনেককাল ধরে বৃটিশ ভারতের সীমান্ত বাহিনীকে অবজ্ঞাভরে দূরে ঠেলে রেখেছে।

আমাদের সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রদ্রোহী ও ধর্মাবলম্বী প্রজাদের সাহায্যপুষ্ট একটা নির্বাসিতের বসতি তীব্র হিংসার বশবর্তী হয়ে কিভাবে যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ জানাতে সাহসী হতে পারে, এটা বোঝা মোটেই শক্ত ব্যাপার নয়। কিন্তু এটা বোঝা খুবই শক্ত, একটা সুসভ্য দেশের সেনাবাহিনীর সুকৌশল ও সমরনীতির বিরুদ্ধে কিভাবে তারা বহু কাল টিকে থাকতে পারে। শেষ পর্যন্ত ১৮৩১ সালে আহমাদ সাহেবের পতন ও মৃত্যু হলো।” [দি ইণ্ডিয়ান মুসলমানস পৃষ্ঠা ১-২১]

পূর্ণ বিদ্বেষ নিয়ে যদিও হান্টার এসব তথ্য পরিবেশন করেছেন, যদিও বিপ্লবী সৈয়দ আহমদের চরিত্রে মিথ্যা কালি মাখিয়েছেন তবুও প্রমাণ হয়ে গেল তার বীরত্ব, বাহাদুরি, সংগঠন ও আত্মত্যাগের কথা। সৈয়দ আহমাদ ও তাঁর অনুসারীরা প্রায় সকলেই কোন্ যুদ্ধে এবং কোন্ ঘটনাকে কেন্দ্র করে শহীদ হন-সে সম্বন্ধে যে তথ্য পাওয়া যায় তা এই রকমঃ বালাকোটের শেষ যুদ্ধের পূর্বেও সৈয়দ আহমদ সাহেব নির্দেশ দিয়েছিলেন, বিপক্ষ সৈন্য পাহাড় থেকে নীচে নামা পর্যন্ত বা তারা আক্রমণ না করা পর্যন্ত আমাদের আক্রমণ বন্ধ থাকবে। পাতিয়ালায় সৈয়দ চেরাগ আলী বিপ্লবী যোদ্ধাদের জন্য পায়ের রান্না করছিলেন আর বিপক্ষ সৈন্যদের ঘাঁটির দিকে লক্ষ্য রাখছিলেন। হঠাৎ তার ভাবান্তর হয়-যে লাঠি দিয়ে তিনি ফুটন্ত পায়ের নাড়াচাড়া করছিলেন তা

দিয়ে তিনি এ তামার হাড়ির গায়ে জোরে জোরে আঘাত করতে লাগলেন। আকাশের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বললেন, 'ভাইসব, স্বর্গ হতে লাল পোষাক পরে অস্পরীরা দল বেঁধে নামছে।' এই বলে অস্ত্র হাতে তিনি কারও পরামর্শ না নিয়েই ছুটতে লাগলেন শত্রু সৈন্যের দিকে। এই ঘটনা এমনই ক্ষিপ্ততার সঙ্গে হইয়া গেল যে, কিসের কি হইল কেহ বুঝিবার পূর্বেই সৈয়দ চেরাগ আলী গুলি লাগিয়ে শহীদ হইলেন। তিনিই বালাকোটের প্রথম শহীদ। (দ্রষ্টব্য 'হঃ সৈয়দ আহমাদ শহীদ', পৃষ্ঠা ৫৯৮)

বাধ্য হয়েই পরিকল্পনা বিরোধী কাজ মুজাহিদ বাহিনীকে করতে হোল, অর্থাৎ এলোমেলোভাবে অপ্রস্তুতির সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়তে হলো ঐ অতর্কিত আক্রমণের বিরুদ্ধে। এবং শেষ পরিণতিতে প্রায় সকলকেই নিহত হতে হয়েছিল। বিখ্যাত লেখক ও বিচারপতির উদ্ধৃতি দিয়ে প্রসঙ্গ শেষ করতে চাইছি-“১৮৩১ খৃস্টাব্দের ৬ই মে এই যুদ্ধ হয়। এটাকে ঠিক যুদ্ধ বলা চলে না। একপক্ষে বিশ হাজার, সুশিক্ষিত সুসজ্জিত সৈন্য... আর এ পক্ষে ভগ্নোৎসাহ প্রায় ৯০০ মোজাহিদ। এ ছিল মৃত্যু, অভিসারীদের বহিবন্যার মুক্তিযুদ্ধ। দুর্দম বেগে তারা ঝাঁপিয়ে পড়লেন। 'জীবন-মৃত্যু মিশেছে যেথায় মত্ত ফেনিল স্রোতে'। শাহাদাত বরণ করলেন সঙ্গীসহ সৈয়দ আহমদ ও শাহ ইসমাইল। (দ্রষ্টব্য ওহাবী আন্দোলন, পৃষ্ঠা ১৯৫)।

১৮৩১ খৃস্টাব্দে হযরত আহমদ সাহেব শহীদ হলেও তাঁর সংগঠন ও আন্দোলন কিন্তু শহীদ বা শেষ হয়নি। পরবর্তী কালে তথাকথিত সিপাহী বিদ্রোহ এবং ১৯৪৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত যারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন, তাঁরা এবং তাদের আন্দোলন সৈয়দ আহমাদ বেরেলীর (রঃ) অঙ্কুরিত বীজের সফল বৃক্ষ বলা যায়। [দ্রষ্টব্য ভারত পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সত্যিকারের ইতিহাসঃ শ্রী রতন লাহিড়ী, পৃষ্ঠা ৯]।

প্রকৃত স্বাধীনতা সংগ্রামের চাপা দেয়া ইতিহাস

বেরেলীর সৈয়দ আহমদ শহীদে (রঃ) নিহত হওয়ার পর যেসব আন্দোলন বা বিদ্রোহ সংগ্রাম সংঘটিত হয়েছিল সেগুলোকে বিকৃত করে, তাদের নাম পাণ্টে কোনটাকে বলা হয়েছে সিপাহী বিদ্রোহ, কোনটাকে বলা হয়েছে ওহাবী আন্দোলন, ফরায়েজী আন্দোলন, মহম্মদী আন্দোলন আবার কোনটাকে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বলে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ওহাবী নেতাদের 'ওহাবী' বলা মানে তাদের শ্রদ্ধা করা তো নয়ই, বরং নিশ্চিতভাবে গালি দেওয়াই হয়; সেহেতু সেই মহান বিপ্লবীরাই তাদেরকে ওহাবী নামে আখ্যায়িত করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ পুস্তকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অমলেন্দু দে-ও একথা উল্লেখ করেছেন(পৃষ্ঠা ৬৫)। সে জন্য আমরা আমাদের আলোচনায় 'সিপাহী বিদ্রোহ' এবং 'ওহাবী' বা ফারাজী আন্দোলনের পরিবর্তে স্বাধীনতা সংগ্রাম, মহাবিপ্লব, মহাবিদ্রোহ এবং ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে ওহাবী ফারাজী ও মহম্মদী শব্দের পরিবর্তে বিপ্লবী, সংগ্রামী প্রভৃতি সম্মানসূচক শব্দ ব্যবহার ভাল মনে করি। এমনকি উদ্ধৃতির কোন কোন ক্ষেত্রেও আমরা ঐ শব্দ গুলো বাদ দিয়ে মূল শব্দের প্রথম অক্ষর বন্ধনীর মধ্যে রাখবো- যেমন ওহাবী বা অহাবীর ক্ষেত্রে (ও.বা অ.) ফারাজীর ক্ষেত্রে (ফ) ইত্যাদি। উদ্দেশ্য হোল, ভবিষ্যতে যাতে এই কল্লিত, মিথ্যা শব্দগুলোর বহুল প্রচার না হয়।

এই প্রসঙ্গে আরও জানিয়ে রাখছি যে, অনেকক্ষেত্রে দেখা যায়, অনেকের একাধিক নাম থাকে। যেমন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অপর নাম ছিল গদাধর। এখন ইতিহাসে যদি তাকে গদাধর বলে প্রকাশ করা হয়, তাহলে তা অনিচ্ছাকৃত হলে অসাবধানতা এবং ইচ্ছাকৃত হলে অসভ্যতা বলে মনে করা যেতে পারে। তেমনি,

স্বামী বিবেকানন্দের পূর্ব নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ। তার আগে নাম ছিল বীরেশ্বর; সেই বীরেশ্বরের সংক্ষিপ্ত 'বীরে' থেকে ক্রমে ক্রমে বিলে বলেই তাকে ডাকা হত। (মনীষীদের ছোটবেলাঃ বিমল ঘোষ, পৃষ্ঠা ৮৯)।

এখন তার স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাস যদি স্বামী বিলে বলে আরম্ভ ও শেষ করা হয় তাহলে তা হবে অতীব দুঃখের। কিন্তু অনেকক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, বিখ্যাত বিখ্যাত নেতাদের আসল নামের পরিবর্তে, জানিনা কোন উদ্দেশ্যে ছেলে বেলাকার আজো বাজে নাম ব্যবহার করা হয়েছে-যেমন তিতুমীর, নোয়ামিঞা, দুদু প্রভৃতি। এই ঐতিহাসিক ভুলটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক। আমরা তাই তাদের আসল ও সুন্দরতম নাম ব্যবহার করার পক্ষপাতি।

প্রথমে ওহাবী জিনিসটা কী, সে সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করছি। আরবদেশে ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে আব্দুল ওহাবের ছেলে মহম্মদের জন্ম হয়। আরব দেশের নিয়মানুযায়ী এই নাম 'মহম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাব' বলে বর্ণিত হয়। জন্ম স্থানের নাম ছিল নাজদ। এই ওহাবী আন্দোলনের নায়কের আসল নাম মহম্মদ। ইংরেজদের কারসাজিতে ছেলের পরিবর্তে বাপের নামেই ইতিহাস তৈরী হয়েছে; তাদের রাখা ঐ নাম হল ওহাব।

আরব দেশে যখন শিরক, বেদআত ও অধর্মীয় আচরণ ছেয়ে গিয়েছিল তখন তা রুখতে ঐ ওহাবের পুত্র মহম্মদ প্রতিবাদী দল গড়ে তোলেন। ক্রমে ক্রমে তা রাজনৈতিক সংঘর্ষে রূপ নেয়। ১৭৪৭ সালে রিয়াদের শেখের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। ১৭৭৩ সালে রিয়াদের শাসক দাহহাম আঃ ওহাবের পুত্র মহম্মদের কাছে ভীষণভাবে পরাজিত হন। আরববাসীরা এই ঘটনার পর দলে দলে তাঁর পতাকাতলে সমবেত হয়। অবশেষে ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে তিনি মারা যান। ওহাবী আন্দোলনের ১১৬ পৃষ্ঠায় আছে- “আব্দুল ওহাবের ধর্মীয় শিক্ষা ও মতবাদের আলোচনায় প্রথমেই বলে রাখা ভাল, আরবদেশে 'ওহাবী' নামাঙ্কিত কোন মাযহাব বা তরিকার অস্তিত্ব নেই। এই সংজ্ঞাটির প্রচলন আরব দেশের বাইরে এবং এই মতানুসারীদের বিদেশী দুশমন, বিশেষতঃ তুর্কীদের ও ইউরোপীয়দের দ্বারা ওহাবী কথাটির সৃষ্টি এবং তাদের মধ্যেই প্রচলিত। কোনও কোনও ইউরোপীয় লেখক, যেমন নীরব আব্দুল ওহাবকে পয়গম্বর বলেছেন। এসব উদ্ভট চিন্তার কোন যুক্তি নেই। প্রকৃতপক্ষে আব্দুল ওহাব কোন মাযহাবও সৃষ্টি করেননি, চার ইমামের অন্যতম ইমাম হাম্বলের মতানুসারী ছিলেন তিনি এবং তাঁর প্রচেষ্টা ছিল, বিশ্বনবীর এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে ইসলামের যে রূপ ছিল, সেই সহজ সরল ইসলামে প্রত্যাবর্তন করা (জাফিস আঃ মওদুদ)। তারিখ হিসেব করে দেখা যায়, আরবের মহম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাব যখন মৃত তখন সৈয়দ আহমদ বেরেলীর বয়স মাত্র এক বৎসর। তার সঙ্গে যে এর কোন যোগাযোগ ছিল না তা স্পষ্টই প্রমাণ হয়। (চলবে)

